গোপাল থেকে দাশু: 'জানা' মিথের ভাঙা-গড়া

ভাষার প্রাথমিক কাজ সংজ্ঞাপন, আশা করা যায় সকলেই মানবেন । আর সেই সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে শব্দ। বস্তুত শব্দের সঙ্গে শব্দের যথার্থ সংসক্তিতেই সার্থক সংজ্ঞাপন ঘটে। এসবই নিশ্চিত বহুবার জানা কথা, তবু মিথ সংক্রান্ত আলোচনায় ঢোকার আগে আরেকবার স্মরণ করা শুধু এই কারণেই যে শব্দের কারসাজি বোঝা যে একটি জরুরী প্রক্রিয়া, সেই বিষয়ে সন্দেহ নিরসন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন প্রস্থান থেকে আধুনিক সেমিওটিক্সের চর্চায় সেই সন্দেহ নিরসনের চেষ্টাই ধৃত। 'শব্দ ব্রহ্ম' –বক্তব্যটি তাই হয়তো বর্তমানে উৎস সন্ধান নির্বিশেষে স্বতোসিদ্ধ। মিথের আলোচনায় যাওয়ার আগে এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত থাকলে আমাদের বক্তব্য পেশের কিঞ্চিৎ সুবিধা।

'মিথ'- শব্দটির উচ্চারণে আমাদের সামনে যে চেনা ছকটি আসে তাকে অক্সফোর্ড অভিধান বিবৃত করছেন এইভাবে- "A traditional story, especially on concerning the early history of people or explaining a natural or social phenomenon and typically involving supernatural beings or events."[১] অর্থাৎ এমন একটি প্রচলিত গল্প যা প্রাক্-ইতিহাস সংশ্লিষ্ট মানুষ সংক্রান্ত অথবা একটি প্রাকৃতিক বা কাল্পনিক ফেনোমেনন সংক্রান্ত এবং যা অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্বলিত। এই সংজ্ঞাটি থেকে মিথ সংক্রান্ত চিরায়ত ধারণাটি স্পষ্ট হয়। মিথ বলতে অধিকাংশে যা বোঝেন, অর্থাৎ সুপ্রাচীন কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক গল্প যার মধ্যে ধরা রয়েছে কিছু অমোঘ অনুচ্চারিত নিয়ম সমাবেশ। তার ক্ষমতা মূলত নির্দেশাত্মক কিন্তু তার সামগ্রিক পরিবেশন গল্পের একটি ছদ্ম আবরণে আবৃত। সহজে বুঝলে "এইরকম হলে তার ফলশ্রুতিতে এইরকম হয়" এই জাতীয় বোধের জন্ম দিতে মিথ সক্ষম। ফলে মিথের আলোচনায় কিংবা আধুনিক কালে মিথের পুনর্নির্মাণে পুরাণ, কল্প-ইতিহাস, ফেনোমেনোলজির অনুসঙ্গ এসে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু আমরা মিথের এই চিরায়ত পাঠকে একটু অন্যভাবে দেখতে চাইছি। 'মিথ' বলতে অভিধান বর্ণিত গতানুগতিক ধারার বাইরে ভিন্নতর কোনো অর্থের দ্যোতনা রয়েছে কিনা, বুঝে নিতে চাইছি তাকেও। কিন্তু কীভাবে? তবে কি মিথের আবার অন্যতর সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন? নাকি মিথ স্বয়ং তার নিজের মধ্যে স্থিত উপাদানের নিরিখেই নিজের সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করার ইঙ্গিতবাহী? এই

প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সংক্ষেপে বুঝতে হবে মিথ সম্বন্ধে আমরা যা ‘জানি’ তা কী? সেই ‘জানা’র প্রকারটাই বা কী?

যেকোনো ‘জানা’র ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে প্রশ্ন তৈরী হয় যে ‘কে জানে? কী জানে’? প্রথমটির উত্তর হতে পারে- ব্যক্তি-চৈতন্য; কিন্তু কেবল আপন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতায় যে বোধগম্যতা তৈরী হয় তাই কি কেবল জানা? যদি তাই হয় তবে ব্যক্তিমানুষের পক্ষে তার ব্যাপ্তিতে কতটুকুই বা জানা সম্ভব? বড়োই খন্ড নয় কি সেই জানার পরিধি? আবার দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ যে জানে সে ‘কী জানে’র উত্তর খোঁজার দিকে গেলে দেখা যাবে প্রতি মূহুর্তে জ্ঞাতার চৈতন্য যে অজস্র তথ্যরাশির মুখোমুখি হচ্ছে, সেই সব তথ্যরাশির সঙ্গে চলছে তার নিরন্তর লেনদেনের উভমুখী ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াজাত জ্ঞানই সে ‘জানে’। সেই লেনদেন অবশ্যই প্রশ্নহীন নয়, নিয়মিত প্রশ্ন জ্ঞাতার চৈতন্যকে ‘মিথ্যাজ্ঞান’ এড়াতে সাহায্য করে। যদিবা কখনো সাময়িকভাবে ব্যক্তি চৈতন্য মিথ্যাজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, তবে ভবিষ্য প্রশ্ন করার সম্ভাবনা তাকে সেই আচ্ছন্নতা কাটাবার সুযোগ দেয়। কোনো এক বিশেষ মুহুর্তে বাহ্যত দেখলে অবশ্য এই লেনদেনকে খন্ড বলে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু চলমানতার নিরিখে এ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যখন আমি দাবি করছি ‘আমি জানি’, আসলে সেই আমিটি তো জীবনের কোনো এক বিন্দুতে যে টুকরো ‘আমি’টি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বিন্দুমূহুর্ত পর্যন্ত আমার ‘জানা’র যোগফল। তার মানে এই জানার প্রক্রিয়া এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া যাতে আমার পূর্ব ইতিহাস, তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতিরেকেই, নানাভাবে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ ‘আমি জানি’র ঐ বিশেষ মূহুর্তে আমি, আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং পূর্ব ইতিহাস সহ অন্যান্য সূত্রজাত জ্ঞানের যৌথতায় অবস্থিত। তার মানে আমার অজান্তেই আমার জানার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে পূর্বজদের অজস্র জানা। তখন আমার জানাটি আর কেবল খন্ড জানায় স্থিত নয়, তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে পূর্বোক্ত সেই প্রবহমান জানার প্রক্রিয়া। ‘আমি’(যে জানে) সেই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হই, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি, আবার সেই প্রবহমান ধারায় গতিশীল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করি। অর্থাৎ মিথ সম্বন্ধে আমার ‘জানা’ কেবল কিছু শব্দ সংসক্ত গল্প-বাক্য বা আপ্তবাক্য জানা নয়, একই সঙ্গে মিথ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ইতিহাস বোধকে আমার চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু অন্যান্য

জানার সঙ্গে মিথকে জানার মধ্যে ফারাক আছে। মিথ এমন এক জ্ঞাতব্য, যা প্রশ্নহীন, যাকে জানার পর আর প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু কীভাবে?

আমরা একটু আগেই আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে ব্যক্তি চৈতন্যের সঙ্গে নিরন্তর সপ্রশ্ন লেনদেনের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে জ্ঞাতার 'জানা'। অর্থাৎ বাহ্য আগত তথ্যরাশির সঙ্গে ব্যক্তি চৈতন্যের একটি দ্বিপাক্ষিক তর্ক-বাচনের সম্পর্ক রয়েছে। খেয়াল করতে হবে আমরা জানার অনুসঙ্গে তাই প্রায়শই 'বোঝা'কে ব্যবহার করি। অর্থাৎ আমরা কেবল বাহ্য আগত তথ্যরাশিকে যেমনটি-তেমন ভাবে চৈতন্যে ধারণ করি না, তাকে প্রশ্ন করে তার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করি, নিরন্তর তর্কের মাধ্যমেই তাকে আত্মস্থ করি, বা তাকে 'বুঝি'। জানা যদি প্রশ্নহীন হয় তবে তা হয় স্বতোসিদ্ধ কিংবা নির্দেশাত্মক ভঙ্গিতে আমাদের চৈতন্যের সামনে এসে উপস্থিত হয়; ঠিক যেমনটি হয় মিথের ক্ষেত্রে। মিথের অস্তিত্ব প্রশ্নহীন। তাই সে কখনো নির্দেশাত্মক, কখনো তার উপস্থিতি স্বতোসিদ্ধের মতো। কিন্তু কীভাবে মিথ হয়ে উঠলো তর্কের অতীত? মিথকে কেবল পৌরাণিক কাহিনি কিংবা সামাজিক ফেনোমেননের সাথে সংশ্লিষ্ট আখ্যান হিসাবে না দেখে, যদি দেখতে চাই ভাষার মতো একটি দ্বিপাক্ষিক বাচন হিসেবে, যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন রঁল্যা বার্থ[২], তাহলে মিথের প্রশ্নহীন অস্তিত্বের কথা বুঝতে আমাদের খানিক সুবিধা হবে। মিথ স্বয়ং একপ্রকার 'জানা', কেবল ব্যক্তি চৈতন্যের জানার পরিবর্তে এখানে গোষ্ঠীর জানা প্রকাশিত। বার্থ তাঁর মিথ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা *Mythologies* এ দেখাচ্ছেন[৩] কীভাবে মিথও আসলে ভাষার মতোই চিহ্নক-চিহ্নণ (signifier-signified) যুক্ত প্রক্রিয়া। আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে চিহ্নক-চিহ্নণ যুক্ত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সিস্টেম। কিন্তু মিথের ক্ষেত্রে ভাষার মতো দ্বিপাক্ষিক বাচনে শ্রোতার(যিনি আবার দ্বিতীয় বক্তাও বটে) ভূমিকা নগণ্য, অর্থাৎ মিথের সঙ্গে বাচনে রত একক ব্যক্তি চৈতন্য কখনোই মিথে বলা আখ্যানের যৌক্তিক পারম্পর্য নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়না। একই প্রক্রিয়া ঘটে মিথ সম্বন্ধীয় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী-চৈতন্যের 'জানা'তেও। কারন প্রশ্নের অধিকার মিথের এলাকায় অচল; 'কোনো প্রশ্ন নয়'- লালমোহনবাবুর এই বিখ্যাত উক্তিটি মিথ হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত। কোনো মিথকে যদি কখনো কোনো প্রশ্নের অবকাশ আসে তবে তাঁর থেকে তৈরী হতে পারে আরেকটি মিথের

জন্ম-সম্ভাবনা। তাই মিথকে জানার যে গোষ্ঠী প্রয়াস তা মূলত এই প্রশ্নহীনতার সাপেক্ষেই নির্মিত।

খানিক আগেই আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে প্রকৃতিগত ভাবে 'জানা' কীভাবে একটি সতত চলমান প্রক্রিয়া; কিন্তু মজার বিষয় হলো এই যে মিথের ক্ষেত্রে জানার এই চলমানতা পূর্ণ অনুচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে। কারন সেই প্রশ্নহীনতা। কিন্তু তাহলে কি মিথ সম্বন্ধে জানা শেষ হয়ে গিয়েছে? কারণ জানার প্রক্রিয়ার যে চলমানতা তা এই তর্কাভ্যাসের উপরই দাঁড়িয়ে আছে যে। মিথের ক্ষেত্রে জানার প্রসঙ্গটি খানিক থমকে থাকাই বটে। একটি জনগোষ্ঠী, যখন কোনো আখ্যানকে মিথে পরিণত করে তখন সাময়িকভাবে সেই আখ্যান সম্বন্ধে তার 'জানা'কে সে স্মৃতি-কুঠুরীর চৌখুপ্পির মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখে। কারণ ক্রমাগত জানতে গেলে নিরন্তর প্রশ্ন জরুরী, কিন্তু মিথ প্রশ্নহীন। যদি কখনো সেই তালা খোলার অবকাশ তৈরি হয় তো সেই মিথ পুনর্নির্মিত হয়, আত্মপ্রকাশ করে নবকলেবরে। আধুনিক যুগে তাঁর নিদর্শন অজস্র। এই প্রসঙ্গে বার্থের মিথ সংক্রান্ত বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে আমরা কেবল এইটুকু যোগ করতে চাই যে, মানব চৈতন্যের অন্যান্য জানার সঙ্গে মিথকে জানার একটি মৌলিক ফারাক রয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে চিহ্নক ও চিহ্নণ যুগপৎ ভাবে 'জানা'র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই ক্ষেত্রে চিহ্নক ও চিহ্নণ উভয়কে জানাই জ্ঞাতব্যকে জানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, মিথের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গল্পটি যা আদপে চিহ্নক, তাকে কিন্তু আমরা মুখ্যত জানতে চাইনা, বা বলা ভালো 'জানি' না, 'জানি' তার অন্তর্বস্তু, চিহ্নণকে। ধরা যাক, আপনি একটি মোড়কে আচ্ছাদিত বস্তু সম্বন্ধে জানতে চান, কিন্তু মোড়ক আচ্ছাদিত থাকায় কেবল তার বাহ্য মোড়কটি সম্বন্ধেই আপনার জ্ঞান হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে জানতে আপনাকে মোড়কটি খুলতে হবে। মিথের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গল্পটি হলো সেই মোড়কের আচ্ছাদন, চিহ্নক। আর মোড়কের অন্তর্বস্তু হলো সেই জ্ঞান, চিহ্নণ, যাকে আপনি জানতে চান। 'আমি মিথটি জানি' এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুচ্চারেই বলা হয়, আসলে মিথের গল্পটি নয়, তার অন্তর্নিহিত বার্তাটি জানি; ঠিক মোড়ক আচ্ছাদিত বস্তুর মতো। আরেকটু বিশেষ ভাবে বললে বলা যেতে পারে, প্রমাণ হিসেবে ভারতীয় দর্শন যাকে 'উপমান' বলেছেন[৪], মিথ কতকটা তাঁর সঙ্গে তুলনীয়। ন্যায়-দার্শনিকেরা যে সাদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণে পৌঁছতে চেয়েছেন, মিথও

খানিক সেই রকম চেষ্টা করে বৈকি। কেবল ফারাক এইখানে যে ন্যায়ের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য একত্রেই আসে সর্বদা, মিথের ক্ষেত্রে প্রশ্ন না করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈসাদৃশ্যের সম্ভাবনার অবলুপ্তি ঘটে। আর যদি থেকে যায় কোথাও বৈসাদৃশ্যের চুঁইয়ে পড়ার এতটুকু সুযোগ, তবে সেখান থেকেই জন্ম নেয় মিথের প্রতিস্পর্ধী অবস্থান, কখনো বা নতুন মিথের। কিন্তু নিছক শিশুপাঠ্য হিসেবে লেখা গোপাল-রাখাল আখ্যান[৫] বা দাশুর গল্পের[৬] সঙ্গে এর যোগ কী?

মিথের চিরায়ত ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় সৃষ্ট গোপাল-রাখাল এই বাইনারি অবস্থানটিকে মিথ বলা মুশকিল আছে; কিন্তু বার্থের প্রস্তাব অনুযায়ী মিথকে যদি একটা চিহ্নক-চিহ্নণ সমন্বিত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সিস্টেম হিসেবে দেখি, যেখানে শ্রোতার প্রশ্নহীন অবস্থান সত্ত্বেও একটি দ্বিপাক্ষিক বাচনের ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনা আছে, তাহলে উনিশ শতকের শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে ‘গোপাল-রাখাল’কে মিথের মর্যাদা দেওয়া বোধহয় খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু কীভাবে গড়ে উঠলো এই মিথ? কীই বা তার পরিণতি? উপরন্তু মিথের নির্মাণের জন্য গোষ্ঠী চৈতন্যে তার উপস্থিতি প্রয়োজন, সেখানে ব্যক্তি অথারের লেখা কি আদৌ শেষ পর্যন্ত মিথ হয়ে উঠতে পারে? উত্তরে বলা যায়, পারে, যদি সেই আখ্যানের মধ্যে ব্যাপক অংশের মানুষকে প্রভাবিত করার এবং সেই আখ্যানের মোড়কে নিহিত অন্তর্বস্তু প্রায় প্রশ্নহীন হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথেই নব্য স্কুল শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি শিশুর ভবিষ্যত সুরক্ষিত ঘেরাটোপে রাখা এবং বাধ্য(যাতে সে প্রশ্ন না করে?) রাখতেই ছিলো গোপাল-রাখালের অনিবার্য দাওয়াই। খুব অল্পদিনেই তা ভীষণ জনপ্রিয় এবং প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে শিশুশিক্ষার কাল্টে পরিণত। ‘কী করণীয়’-এই বিচারে গোপালের অস্তিত্ব প্রশ্নহীন; দুচ্ছাই হতে হতে, নাকচ হতে হতে ‘করণীয় নয়’ এর বিচারে আশ্চর্য ভাবে রাখালও কিন্তু প্রশ্নহীন! মিথে পর্যবসিত উভয়েই। শিশু সাহিত্য কিংবা প্রাইমারের জগতে তারপর অনেকেই যাতায়াত করেছেন, কিন্তু বাঙালি শিশুর জন্য শিষ্ট-গোপালের নির্ধারিত গন্ডীর বাইরে পা বাড়ানোর সাহস দেখান নি কেউই। এও একধরণের ‘মিথ’, যা ব্যক্তি অথারের লেখায় তৈরি। অথার সচেতন ভাবে তাকে মিথ হিসেবে গড়তে চাননি, তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন; মূলত শৈশব নির্মাণ। ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং উত্তুঙ্গ গোষ্ঠী চাহিদা তাকে প্রশ্নহীন করেছে, মিথের চেহারা দিয়েছে। এর পাশাপাশি আবার এটাও ঠিক যে ব্যক্তি অথারের সৃষ্ট বলেই তাকে

প্রশ্ন করার সম্ভাবনা গুলিও তুলনামূলক ভাবে বেশি। যুগ যুগ ধরে লোকশ্রুতি, আখ্যান কিংবা পূর্বজদের জ্ঞানের(সেই জ্ঞান সত্য মিথ্যা যাই হোক) ভিত্তিতে নির্মিত মিথের তুলনায় আধুনিক যুগে ব্যক্তি অথারের সৃষ্ট আখ্যানজাত মিথ প্রশ্নহীনতার নিরিখে খানিক দুর্বল, সন্দেহ নেই। আধুনিকের চিহ্নও প্রশ্ন করা। সেই প্রশ্ন থেকেই শিষ্ট গোপাল অথবা দুষ্ট রাখালের এই অবধারিত সামাজিক অবস্থানের বিপ্রতীপে সুকুমার রায় এনে হাজির করেন দাশু'কে।

গোপালরা সুকুমারের সময়েও ভীষণ ভাবে উপস্থিত, কখনো তার নন্দলালের বেশে কখনো বা জগ্যিদাসের নামে।[৭] এই বুর্জোয়া তথাকথিত গণতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে শ'য়ে শ'য়ে গোপাল তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছিল উনিশ শতকে, নন্দলাল বা জগ্যিদাসের দুর্দশা সেই ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি। উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদার ঘাটতি-বৃদ্ধির উপরই যে আসলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল কাঠামোটি নির্ভরশীল, তা বারংবার নন্দলালদের এই উপাখ্যানের মধ্যে লেখা হয়। কারণ শিক্ষা যেখানে আত্মবিকাশের মাধ্যম নয় সেখানে হামেশাই এই জাতীয় গোলোযোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গোপালের জন্য নির্দিষ্ট করা ছকের বাইরে পা রাখলেই কেবল কি শুধু রাখালের বৃত্তেই গিয়ে পড়তে হবে? মূলত এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে সুকুমার রায় দাশুকে গোপালের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধায় দাশুকে চেনার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন "কে ইহারা? পাগল, না সেয়ানা? বেকুবের বেহদ্দ, না চালাকিতে চিকচাকন চৌখশ? মিচকে, ফাজিল, ইয়ার্কিবাগীশ? ইহাদের যথার্থ সংজ্ঞার্থ কী হইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া হবু-গবু সবাই কুপোকাত, অথবা চিৎপাত।"[৮] আসলে হয়তো এই ধাঁধা লাগানো রহস্যময়তা দাশুর চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। আদর্শ শিক্ষাব্রতী বালকের বিপ্রতীপে যে কেবল রাখাল নয়, কোথাও কোথাও দাশুও বাস করে, হয়তো দেখা যেতে পারে দাশুরাই আদমসুমারীতে সংখ্যা গরিষ্ঠ। দাশু কিন্তু কখনোই রাখালের প্রতিস্থাপনযোগ্য একক নয়, সে নিজেই একটি স্বতন্ত্র অবস্থান। স্যোসুরের[৯] বক্তব্যকে যদি ধরি যে সাদৃশ্য দিয়ে চিহ্ন নির্মিত হলেও আসলে বৈসাদৃশ্যের জোর বেশি, তাহলে দাশুরও চরিত্র চরিত্র লক্ষণ বুঝতে গোপালের সঙ্গে তার সার্বিক বৈসাদৃশ্যগুলিই কাজে আসে পারে। গোপাল-রাখালের বিপ্রতীপে এই তৃতীয় অবস্থানটি তাই ক্রমশ জনপ্রিয় হয়েহে। নাম না জানা কত 'দাশু' তার পরবর্তীতে আশ্রয় পেয়েছে এই চরিত্রের ছত্রছায়ায়। গোপাল আর রাখালের বাইনারির বাধ্যতার মধ্যে

ছটফট করতে থাকা ঔপনিবেশিক শৈশব যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছিল, দাশুর ক্রমশ প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠা, তার প্রমাণ। মিথের 'জানা' এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে, প্রশ্নহীন অবস্থানকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জন্ম দিয়েছে এমন এক নূতন মিথের যা নিজেই নিজেকে ভাঙার জন্য সতত ব্যগ্র। পাঠক সঙ্গত প্রশ্ন করতেই পারেন, যদি ভাঙবেই বা, তবে তা মিথ হলো কীভাবে? উত্তরটি লুকিয়ে আছে দাশুর চরিত্রের মধ্যে। সেই মোড়ক আর তার ভিতরের বস্তুর গল্প; আমি আসলে 'জানতে চাই' ভিতরের বস্তু বা চিহ্নণকে, কিন্তুবাহ্যত দেখে মনে হয় আমি 'জানছি' বাইরের মোড়ক বা চিহ্নক বা দাশুর অদ্ভুতুড়ে কীর্তিকলাপ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার জানতে চাওয়া চিহ্নণটির স্বরূপ কী? দাশুর মতো প্রায় বিদূষক আধুনিক চরিত্রের মজাটাই এইখানে যে তার চিহ্নণটি সুনির্দিষ্ট, প্রত্যাশিত ছকের বাইরে। এইটি শেষ পর্যন্ত বদ্ধ নয়, খোলামুখ চিহ্নণ। অর্থাৎ নয়-গোপাল অথচ সম্পূর্ণত রাখাল না হতে চাওয়া পাঠকের আকাঙ্ক্ষা এই চিহ্নণটিকে প্রতি মূহুর্তে নির্মাণ করে চলেছে। চিহ্নণটি মিথ, কারণ গোপাল-রাখালের বাইরে অসংখ্য তৃতীয় বর্গের মানুষের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তা সঞ্জাত। কিন্তু এইটি পরিবর্তনশীল, আধুনিকের গন্ধ এর পরতে পরতে মোড়া। কেউ চাইলে দাশুর গল্পকে তার নিজের গল্প দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পারে; সেতো শুধু মোড়কের পরিবর্তন। কিন্তু ওই যে তৃতীয় বর্গের দাশু হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তাদের 'জানা'টাই এই প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে, নিয়মিত। তাই 'জানা' থেকেই মিথ, 'জানা'ই মিথমুক্তি।

তথ্যসূত্রঃ

১. Oxford Dictionary কৃত মিথে (Myth) র সংজ্ঞা।

২. Roland Barthes. *Mythologies*, (Trans. by Annette Lavers) The Noonday Press, 1991, NewYork. এই বইটিতে বার্থ মিথ সংক্রান্ত চিরায়ত ধারণাগুলিকে ভেঙে ভাষা ও মিথের সংযোগ এবং মিথের স্বয়ংসম্পূর্ণ তন্ত্র সম্বন্ধে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৩. ঐ, পৃঃ- ১১৩।

৪. প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়-দার্শনিকেরা 'উপমান' নামক একটি প্রমাণের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে যুক্তি বিবাদ চলেছে বহুকাল।

৫. ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বাংলা প্রাইমার ‘বর্ণপরিচয়ের’ দুই চরিত্র। সময় পরবর্তীতে দুটি পৃথক অবস্থানের চিহ্নক।

৬. সুকুমার রায় সৃষ্ট চরিত্র দাশু ওরফে পাগলা দাশু।

৭. সুকুমার রায়ের ‘নন্দলালের মন্দ কপাল’ ও ‘জগ্যিদাসের মামা’ গল্পদুটির চরিত্র।

৮. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শেক্ দি বট্‌ল্! শেক্ দি বট্‌ল্!’, অনুপম মজুমদার ও আশিষ লাহিড়ী (সম্পাদিত) ‘প্রস্তুতি পর্ব’, কারিগর, ২০১৩, কলকাতা।

৯. উনিশ শতকের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরের ভাষাকে বোঝার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অবদান গুলির মধ্যে অন্যতম হলো ভাষাকে signifier ও signified এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা। শব্দের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যর যুগপৎ ভূমিকা বিশ্লেষণও তার কাজের আওতাভুক্ত। আগ্রহীরা বিস্তারে জানার জন্য তার মূল বইটির ইংরেজি অনুবাদ ‘General Linguistics’ দেখতে পারেন।

ডঃ সৌম্য ভট্টাচার্য

অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর,

বাংলা বিভাগ, দি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ।